কিশোরী মায়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করনীয়

সিরাজুম মুনিরা

স্কুল থেকে ফিরে এসেছে কিশোরী শিউলী,সবে ক্লাস টেনে উঠেছে। মা এসে বললেন “কাল থেকে আর স্কুলে যেতে হবে না, তোমাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে” তারপর বিয়ে। প্রতিবাদ করতে চাইলো কিন্তু ছোট-১৫ বছরের শিউলীর কতটুকু বা শক্তি আছে সমাজে এত বড় ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়বার। মেধাবী ছাত্রী হিসাবে শিউলীর স্বপ্ন- সে লেখা পড়া শিখে বড় হবে,নিজের পায়ে দাঁড়াবে, গরীব বাবার সংসারে সাহায্য করবে। কিন্তু অচেনা, অনিশ্চিত এক জগতে ঠাইয়ের জন্য তাকে ঠেলে পাঠানো হল, এবং সংসার ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী কিশোরী শিউলীর গর্ভে এসে গেল সন্তান। এমন শিউলী একা নয়। সবথেকে বেশি সংখ্যায় কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে ১১৩ টি শিশুই কিশোরী মায়ের সন্তান। এসডিজির সূচকে কৈশোরকালীন মাতৃত্ব কমানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা আমাদের দেশের জন্য এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গত বছর গুলোতে দেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নারী শিক্ষা, সফল টিকাদান কর্মসূচি এবং পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্যই এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই সফলতার পরও আমাদের অনেক অর্জন ম্লান হয়ে যায়, যখন একটি মেয়ে কিশোরী বয়সে মা হতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

কিশোরী মায়েদের ঝুঁকিসমূহঃ আমাদের দেশের আইনে আছে, আঠারোর আগে বিয়ে নয়, কুড়ির আগে সন্তান নয়। এর মধ্য দিয়ে কিশোরী মাতৃত্বকে মূলত না করা হয়েছে। কারণ, কিশোরী মাতৃত্বের ফলে অনেক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। ডব্লিউএইচওর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ১১ থেকে ১৯ বছর বয়সের মেয়েদের কিশোরী বলে। কিশোরী মাতৃত্ব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একটি শিশুর গর্ভে আরেকটি শিশুর জন্ম কখনোই নিরাপদ হতে পারে না। এ অবস্থায় মা হলে তারা নানা জটিলতায় ভোগে। ৬০ শতাংশ কিশোরী মা রক্ত স্বল্পতায় ভোগে। তাদের পুষ্টির অভাব থাকে। অপুষ্ট মায়ের বাচ্চা সেও অপুষ্টিচক্রে ভোগে। কিশোরী অবস্থায় গর্ভবতী হলে গর্ভপাত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। একলামসিয়ার মতো খিঁচুনি রোগ হতে পারে। বাধাগ্রস্ত প্রসব হয়। যে কারণে মৃত সন্তান জন্মের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বাধাগ্রস্থ প্রসবের জটিলতায় মায়ের জরায়ু ও যোনিপথ এক হয়ে অনবরত পেশাব ঝরতে থাকে। মা জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে।

বাংলাদেশে "কিশোরী মা" এর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশী। ১৮ বছর পার হওয়ার আগে কিশোরী অবস্থায় মা হবার মতো মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তৈরী হয়না এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানো এবং লালন পালন করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আর বুদ্ধিও হয়না এদের মধ্যে। যে তার নিজের যত্ন নিতেই ঠিকমতো শিখে নাই সে কি করে তার গর্ভাবস্থায় বাচ্চার যত্ন নেবে। শঙ্কার জায়গা হচ্ছে কিশোরীদের গর্ভপাতের সংখ্যা এবং গর্ভপাতজনিত জটিলতায় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ, ইনফেকশন বা সেপটিক হয়ে অনেক কিশোরী মায়ের মৃত্যু হয় আবার অনেকে বেঁচে গেলেও রক্তস্বল্পতা রোগে ভোগে ও প্রদাহের কারণে তাঁদের প্রজনন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলতে পারে।

ইউনিসেফের তথ্যমতে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মা হওয়ার মৃত্যুঝুঁকি ২০ বছরের নারীদের থেকে দ্বিগুন। অন্যদিকে ১৫ বছরের কম বয়সী মায়েদের প্রসবজনিত মৃতুঝুঁকি পাঁচগুণ বেশি। কিশোরী মায়েদের বাচ্চা প্রসবের ২৮ দিনের মাধ্যে মারা যাবার আশঙ্কা দেড়গুণ বেশি। এছাড়াও ১৫-১৯ বছরের মায়েদের মারা যাবার দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ কারন হলো গর্ভকালীন জটিলতা ও সন্তান জন্মদান। বাংলাদেশের এখনও ৫২ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছর বয়সের নিচে বিয়ে হয়। ৭০ লক্ষ কিশোরী যারা প্রসূতি অবস্থার কারনে জীবন ঝুঁকিতে থাকে। কিশোরী মায়েদের প্রি-টার্ম লেবারের রিস্ক বেড়ে যায়। এতে সময়ের আগেই শিশুর জন্ম হতে পারে। ঐ ধরনের শিশুকে প্রি ম্যাচিউর বেবি বলা হয়ে থাকে, এতে শিশুর ওজন কম সহ অন্যান্য অনেক জটিলতা হতে পারে।

কম ওজনের নবজাতকের, বেঁচে থাকা এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠু বিকাশ লাভের সুযোগ কমে যায়। বেঁচে গেলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং এসব শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ধীরগতিতে হয়। এছাড়াও প্রি-এক্ল্যামশিয়া ও মোলার প্রেগনেন্সির মতো রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য বাল্যবিবাহ দায়ী। কিশোরী মা হওয়ার কারনে একজন যুবতীর জীবনে অনেক স্বপ্নই অঙ্কুরে শেষ হতে পারে। যেমনঃ তাদের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি।

কিশোরী গর্ভাবস্থা বিভিন্ন কারণের কারণে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। প্রথমত, বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্কতা গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের শারীরিক চাপ সামলানোকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিসেবাগুলিতে অ্যাক্সেস প্রায়শই কিশোর-কিশোরীদের জন্য সীমিত থাকে, যার ফলে গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সময় উপযুক্ত চিকিৎসা যত্ন বিলম্বিত হতে পারে। উপরন্তু, বাংলাদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলিও কিশোরী মায়েদের মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশে বাল্যবিবাহ এখনও প্রচলিত, এবং অল্প বয়সে বিয়ে করা মেয়েদের কিশোর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারন তাদের নিজের শরীরের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকেনা, যা তাদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

করনীয় কিঃ সবার আগে শিশুর বাল্য বিয়ের প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য সবার আগে গণ সচেতনতা তৈরী করতে হবে। মেয়েদেরকে শিক্ষিত, স্বনির্ভর করতে হবে। যেন তারা স্বামীর উপর নির্ভরশীল না থাকে। শুধু খাওয়া আর পরার জন্য বিয়ে দেয়া হচ্ছে এই বিষয় থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। কিশোরী মাতৃত্ব রোধে পিতা-মাতার উচিত কিশোরীকে ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে না দেওয়া। স্বামীর উচিত স্ত্রীকে ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান গ্রহণে উৎসাহিত অথবা বাধ্য না করা। উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা। স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডেলিভারির সময়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নেওয়া। পরিবারের সব সদস্যের দায়িত্ব হলো গর্ভবতীকে সহানুভূতির সঙ্গে পরিচর্যা করা। গর্ভকালীন সময়ে মেয়েটিকে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে এক কাপ ঘন ডাল, এক মুঠি বেশি শাক- সবজি ও একটি ফল, ছোট মাছ, এক মুঠি বাদাম, সম্ভব হলে একটি ডিম আর এক গ্লাস দুধ খাওয়ানো।

প্রতিদিন দিনের বেলা অন্তত দু'ঘণ্টা তাকে বিশ্রাম দেওয়া। মানসিক দিক থেকে নির্ভার রাখা। নবজাতকের জীবন রক্ষায় দরকার আরও কার্যকর ও সার্বক্ষণিক অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা, আরও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী এবং উল্লেখযোগ্য হারে জনগণের সুষ্ঠুভাবে হাইজিন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। এছাড়া ভৌগোলিক, লৈঙ্গিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আরও বৃহত্তর আঙ্গিকে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।

কেবল প্রজনন স্বাস্থ্য নয়, 'সুস্থ নারী স্বাস্থ্যে' জোর দিতে হবে। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে মায়েদের স্বাস্থ্যসেবায় নজর দিতে হবে। গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে মোট চারবার ১৬ সপ্তাহ, ২৮ সপ্তাহ, ৩২ সপ্তাহ ও ৩৬ সপ্তাহে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে, পরামর্শমতো চলতে হবে। এ সময় এন্টিনেটাল চেকআপ অবশ্যই জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি অথবা 'স্কিল্ড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট' বা দক্ষ, প্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে সন্তানের জন্ম হওয়াটাও মাতৃমৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দক্ষ জন্ম পরিচর্যা এবং জরুরী প্রসূতি পরিচর্যা পরিসেবার প্রাপ্যতা বাড়ানোও সরকার ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে যে কিশোরী মায়েদের গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সময় মানসম্পন্ন মাতৃস্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগের মাধ্যমে অল্পবয়সী মেয়ে ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ এবং অনিচ্ছাকৃত কিশোরী গর্ভধারণ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। এটি এমন প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে করা যেতে পারে যা লিঙ্গ সমতাকে উন্নীত করে এবং মেয়েদের স্কুলে থাকতে এবং বিবাহ ও সন্তান জন্মদানে বিলম্ব করতে উৎসাহিত করে। এই হস্তক্ষেপগুলি ছাড়াও, কিশোরী গর্ভাবস্থার বিপদ এবং ব্যাপক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নীত করার জন্য মিডিয়া প্রচারণা, কমিউনিটির অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশে কিশোরী গর্ভাবস্থা মোকাবেলায় মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীদের ব্যাপক যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য এবং পরিসেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত এবং সমুন্নত রাখা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের রয়েছে।

পরিশেষে, এটা স্বীকার করা জরুরী যে কিশোরী গর্ভাবস্থার বিষয়টি বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয় এবং এটি একটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয়। এই সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য এবং সমস্ত তরুণদের ব্যাপক যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য এবং পরিসেবাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সংহতি বৃদ্ধির প্রয়োজন।

উপসংহারঃ দেশে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা গ্রহণ আগের তুলনায় বেড়েছে। আর সরকারের বহুমাত্রিক স্বাস্থ্যসেবা তৎপরতার ফলে মাতৃমৃত্যুর হার অনেকটাই কমে এসেছে। দেখা গেছে, গত দেড় দশকে মাতৃমৃত্যুর হার ৪৫ শতাংশ কমেছে। তবে কিশোরী মায়ের মৃত্যুহার এখনো অনেক বেশিই রয়ে গেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ মাতৃমৃত্যুর হার আমরা শতকরা ৭০-এ নামিয়ে আনব, এটা আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি, কোনো একদিন মাতৃমৃত্যুর হার শূন্যতে নামিয়ে আনব। এটা খুব কঠিন কিছু নয়। আমরা কোভিড-১৯ চলাকালে স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা পারি। কাজেই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি অনেক। কোভিড চলাকালে মাতৃসেবা কমে গিয়েছিল। এখন তা আবার বাড়ছে। মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বাড়াতে হবে। মাতৃসেবা যাতে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, সে প্রচেষ্টায় সরকার বদ্ধপরিকর। আমাদের পরিবার, সমাজ, রাজনীতিবিদ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, এন জি ও কমিউনিটি ক্লিনিক সহ সকলের সমন্বিত এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচিৎ নিষ্ঠা আর মমতার সাথে গ্রামীণ এবং শহরে বস্তিবাসী কিশোরীদের যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। সর্বোপরি বাল্যবিবাহ নিরোধে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনে দরিদ্র পরিবারগুলোকে বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহের জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধক কাজে এবং সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার হওয়া উচিৎ। যাতে করে সমাজে মেয়েদের মর্যাদা, সম্মান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সুযোগ বাড়ানো যায়।

#

পিআইডি ফিচার